ভূমিকা

কিছু কথা কুয়াশার

গল্প লেখার শুরুটা হয়েছিল মনের কিছু কথা, কিছু ভাবনা আর জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে শব্দে বুনে রাখার ইচ্ছা থেকে। কখনো চারপাশের পরিচিত মানুষ, কখনো কল্পনার রঙে আঁকা চরিত্র, কখনো নিছক হাস্যরসের কোনো মুহূর্ত, আবার কখনো প্রেম, বিচ্ছেদ কিংবা জীবনের গভীর কোনো অনুভূতি—সবকিছুই ধীরে ধীরে গল্প হয়ে উঠেছে। সেই পথচলারই কিছু নির্বাচিত গল্প নিয়ে এই বই, কিছু কথা কুয়াশার।

এই বইয়ের গল্পগুলো একই সুরে বাঁধা নয়। কোথাও হাসির আড়ালে লুকিয়ে আছে জীবনের সরল সত্য, কোথাও ভালোবাসার মায়া, কোথাও বিচ্ছেদের দীর্ঘশ্বাস, আবার কোথাও সম্পর্কের জটিলতা আর মানুষের মনের না-বলা কথাগুলো। প্রতিটি গল্পের নিজস্ব রং, নিজস্ব ভাষা ও আলাদা অনুভব রয়েছে।

লেখালেখির এই যাত্রায় আমার চাওয়া ছিল, গল্পগুলো যেন শুধু পড়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে; বরং কখনো পাঠকের মুখে হাসি ফোটায়, কখনো মনকে ভাবায়, কখনোবা নিঃশব্দে ছুঁয়ে যায় হৃদয়ের কোনো এক গোপন অনুভূতি।

আমার সেই ছোট্ট চেষ্টারই নাম ‘কিছু কথা কুয়াশার’। এই বইয়ের প্রতিটি গল্প পাঠকের মনে সামান্য হলেও জায়গা করে নিলে, আমার লেখালেখির পথচলা আরও অর্থবহ হয়ে উঠবে।

পাঠকের ভালোবাসা ও আন্তরিকতাই হোক আগামী দিনের লেখার সবচেয়ে বড় প্রেরণা।

সূচিপত্র

- মেঘবাড়ির শেষ বিকেল ৭
- পাত্র ভালো, শুধু একটু... ২০
- সকাল বদল ২৮
- বিয়েবাড়ির গোয়েন্দা ৩৮
- ইনবক্সের সংসার ৪৬
- তুমি, আমি আর প্যারিস ৫৫
- মেরি অ্যানের রোমিও ৬০
- চেনা মানুষের অচেনা... ৭২
- রেসিপি ৭৯
- কিছু কথা কুয়াশার ৮৯
- এখনো বসন্ত বাকি ৯৫
- অদৃশ্য সাক্ষী ১০৪
- বিসর্জনের ওপারে ১১৩
- মেকআপের আড়ালে ১২২
- মাঝির কাছে নদীর গল্প ১২৮
- ক্যাফে অন্তরাল ১৩৬
- প্রজাপ্রতির ডানায় ... ১৪৪
- নীল জলের ওপারে ১৪৯
- অপেক্ষার ট্রেন ১৫৮

মেঘবাড়ির শেষ বিকেল

সাজেকের পাহাড়ে ভোর নামে ধীরে, যেন কেউ নরম হাতে রাতের অন্ধকার সরিয়ে প্রকৃতির গায়ে আলো মাখিয়ে দিচ্ছে। দূরের পাহাড়গুলো তখনও কুয়াশার চাদরে ঢাকা। মাঝেমধ্যে মেঘ এসে জানালার কাচ ছুঁয়ে যায়, আবার নিঃশব্দে মিলিয়ে যায় সবুজের গভীরে। পাখির ডাকে ঘুম ভাঙে উপত্যকার, আর ভেজা ঘাসের গন্ধে ভরে ওঠে সকাল।

মেঘবাড়ি রিসোর্টের দোতলার একটি কটেজের জানালার পাশে দাঁড়িয়ে রিয়ানা প্রতিদিন এই দৃশ্য দেখে। তবু তার বিস্ময় কমে না। শহরের ব্যস্ত জীবন থেকে দূরে, পাহাড়ের এই নিভৃত কোণে দাঁড়িয়ে তার মনে হয়, পৃথিবীর সব ক্লান্তি বুঝি এখানে এসে একটু বিশ্রাম নেয়।

সেদিনও জানালার পর্দা সরিয়ে কিছুক্ষণ পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে ছিল সে। কুয়াশার আড়াল থেকে সূর্যের আলো ধীরে ধীরে উঁকি দিচ্ছিল। অথচ প্রকৃতির সেই শান্ত সকালের সঙ্গে রিয়ানার দিনের কোনো মিল ছিল না।

ঘড়িতে তখন সবে সাতটা পেরিয়েছে। রিসোর্টের রিসেপশন থেকে ফোন এল, আটটার আগেই নতুন অতিথিরা এসে পৌঁছাবেন। রান্নাঘর থেকে সকালের নাশতার তালিকা জানতে চাওয়া হলো। একটি কটেজের গিজার কাজ করছে না, আরেকটির বারান্দায় রাতের বৃষ্টিতে পানি জমেছে। তার ওপর আগের দিন বুকিং দেওয়া এক দম্পতি ফোন করে জানালেন, তাঁরা নির্ধারিত সময়ের আগেই পৌঁছাবেন।

রিয়ানা দ্রুত চুল বেঁধে নিল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের ক্লান্ত চোখ দুটির দিকে একবার তাকাল, তারপর অভ্যাসমতো হালকা হাসি ফুটিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

মেঘবাড়ির ব্যবস্থাপক হিসেবে এই ছোট্ট রিসোর্টটির প্রায় প্রতিটি কাজই তাকে দেখতে হয়। অতিথিদের অভ্যর্থনা থেকে শুরু করে কটেজের ব্যবস্থা, কর্মীদের কাজ বুঝিয়ে দেওয়া, অভিযোগ শোনা—সবকিছুর মাঝেই তার দিন কেটে যায়। অনেকেই ভাবে, পাহাড়ে থাকা মানেই বুঝি সারাক্ষণ মেঘ দেখা আর অবসরে চা পান করা। কিন্তু রিয়ানা জানে, অন্যের অবকাশকে সুন্দর করে তুলতে নিজের অবসরটুকু কতবার বিসর্জন দিতে হয়।

সেদিন অতিথিদের আগমন যেন থামতেই চাইছিল না।

প্রথমে এলেন শামসুল ও নওশিন। বিয়ের প্রায় আট বছর পর তাঁরা প্রথমবার একসঙ্গে কয়েক দিনের ছুটি কাটাতে এসেছেন। তাঁদের সঙ্গে কোনো সন্তান নেই, নেই আত্মীয়স্বজনের ব্যস্ততা। তবু রিসেপশনে দাঁড়িয়ে নওশিনের মুখে হাসি থাকলেও শামসুলের চোখ বারবার ফোনের পর্দায় আটকে যাচ্ছিল।

রিয়ানা কটেজের চাবি এগিয়ে দিয়ে বলল, “আশা করি, এখানে আপনাদের সময়টা ভালো কাটবে।”

নওশিন মৃদু হেসে বললেন, “অনেক দিন পর দুজন একা কোথাও এলাম। দেখি, নিজেদের আবার নতুন করে চেনা যায় কি না।”

কথাটা শুনে রিয়ানা একটু থমকে গেল। নওশিনের হাসিতে এমন কিছু ছিল, যা নিছক ভ্রমণের আনন্দ নয়। যেন দীর্ঘদিনের জমে থাকা অভিমানের ভেতরেও তিনি একটি সম্ভাবনার দরজা খোলা রাখতে চাইছেন।

দ্বিতীয় কটেজে উঠলেন তরুণ ও মেহরিন। সদ্যবিবাহিত দম্পতি। তাঁদের মধ্যে হাসি-ঠাট্টা, ছবি তোলা আর ছোট ছোট আবদারের শেষ নেই। তরুণ বারবার মেহরিনের ছবি তুলছিল, আর মেহরিন প্রতিবারই বলছিল, "এবার ভালো হয়েছে তো?"

দূর থেকে দৃশ্যটা দেখে রিয়ানার ঠোঁটে হাসি ফুটল। ভালোবাসার শুরুতে মানুষ নিজের প্রতিটি মুহূর্তকে ধরে রাখতে চায়। পরে হয়তো সেই মুহূর্তগুলোই দৈনন্দিন জীবনের ভিড়ে কোথাও হারিয়ে যায়।

তবে দুপুরের দিকে মেহরিনকে একা বারান্দায় বসে থাকতে দেখে রিয়ানা থমকে গেল। তরুণ তখন বাইরে ছবি তুলতে গেছে। মেহরিনের চোখে জল চিকচিক করছিল।

রিয়ানা কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কিছু হয়েছে?"

মেহরিন তাড়াতাড়ি চোখ মুছে বলল, "না, তেমন কিছু না। আসলে বিয়ের পর সবাই শুধু বলে, নতুন জীবন কত সুন্দর। কেউ বলে না, নতুন জীবনে নিজের পুরোনো কষ্টগুলোও সঙ্গে নিয়ে আসতে হয়।"

রিয়ানা আর প্রশ্ন করল না। কিছু দুঃখের দরজা বাইরে থেকে খুলে দেওয়া যায় না। মানুষ নিজে যখন খুলতে চায়, তখনই তার ভেতরের আলো দেখা যায়।

এরপর এলেন আরেক দম্পতি—মাধুরী ও তাঁর স্বামী। বয়সে মধ্যবয়স্ক। দুজনের মধ্যে কথাবার্তা খুব কম, কিন্তু একে অন্যের প্রতি যত্নের অভাব নেই। মাধুরীর স্বামী রিসেপশনে দাঁড়িয়ে বারবার জানতে চাইছিলেন, কটেজে যেন গরম পানির ব্যবস্থা থাকে। পরে জানা গেল, মাধুরীর শরীর ভালো নয়। পাহাড়ে আসার ইচ্ছেটা ছিল তাঁর বহুদিনের, তাই অসুস্থতা সত্ত্বেও স্বামী তাঁকে নিয়ে এসেছেন।

কিছুক্ষণ পর মাধুরীকে রিসোর্টের বাগানে বসে থাকতে দেখা গেল। পাশে তাঁর স্বামী চায়ের কাপ হাতে দাঁড়িয়ে। মাধুরী কিছু বলছিলেন, আর লোকটি মন দিয়ে শুনছিলেন। তাঁদের বয়সের ভালোবাসায় কোনো প্রদর্শন ছিল না, ছিল কেবল দীর্ঘদিন পাশাপাশি থাকার নিশ্চিন্ততা।

রিয়ানা দূর থেকে দৃশ্যটি দেখে ভাবল, ভালোবাসার ভাষা হয়তো বয়সের সঙ্গে বদলে যায়। কখনো তা উচ্ছ্বাস, কখনো অভিমান, কখনো নিঃশব্দে পাশে বসে থাকার নাম।

অতিথিদের নানা ব্যস্ততার মধ্যে দুপুর গড়িয়ে গেল। রিসেপশনে ফিরে রিয়ানা বুকিংয়ের খাতা খুলেছিল, এমন সময় দরজার সামনে একটি ছায়া এসে থামল।

“মেঘবাড়িতে কি একটা কটেজ পাওয়া যাবে?”

কণ্ঠস্বরটি শান্ত, সামান্য ক্লান্ত।

রিয়ানা মুখ তুলে তাকাল।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটির কাঁধে ক্যামেরার ব্যাগ, হাতে ছোট একটি ভ্রমণব্যাগ। পরনে ধূসর রঙের জ্যাকেট। চোখে এমন এক গভীরতা, যা প্রথম দেখাতেই ব্যাখ্যা করা যায় না। তার মুখে ক্লান্তির ছাপ থাকলেও দৃষ্টিতে ছিল অদ্ভুত স্থিরতা।

“আগে থেকে বুকিং করেছিলেন?” রিয়ানা জানতে চাইল।

“না। হঠাৎ চলে এলাম। এক রাতের জন্য জায়গা হলেই চলবে।”

রিয়ানা বুকিংয়ের খাতায় চোখ বোলাল। একটি কটেজ খালি ছিল, তবে সেটি পরিষ্কার করার কাজ তখনও শেষ হয়নি।

"কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে।"

লোকটি জানালার বাইরে তাকাল। "অপেক্ষা করতে আমার আপত্তি নেই। পাহাড়ের কাছে এসে তাড়াহুড়ো করার মানে হয় না।"

কথাটা শুনে রিয়ানা প্রথমবার একটু ভালো করে লোকটির দিকে তাকাল। আপনি কি ছবি তোলেন?"
লোকটি কাঁধের ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল। "হ্যাঁ। তবে সব ছবি ক্যামেরায় তোলা হয় না।"

রিয়ানা কথাটার অর্থ বুঝতে পারল না। তবু লোকটির শান্ত স্বভাবের মধ্যে এমন কিছু ছিল, যা তার ব্যস্ত সকালের ক্লান্তির ভেতরেও একটু জায়গা করে নিল।

রেজিস্টারে নাম লেখার সময় সে জানল, লোকটির নাম আহান রহমান।

কটেজের ব্যবস্থা করে দিয়ে রিয়ানা বলল, "আপনার কিছু প্রয়োজন হলে রিসেপশনে জানাবেন।"

আহান চাবিটি হাতে নিয়ে বলল, "আপনার নামটা জানা হলো না।"

"রিয়ানা।"

"সুন্দর নাম।"

আহান ব্যাগটা বুকিংয়ের খাতার পাশে রেখে মৃদু হেসে বলল, “তাহলে প্রথম দিনেই আপনার খাতায় স্মৃতি রেখে গেলাম।”

রিয়ানা হাসি চেপে বলল, “স্মৃতির চেয়ে বিলের হিসাব ঠিক রাখবেন।”

আহান হেসে ব্যাগটা তুলে নিল। আর রিয়ানা আবার নিজের কাজে মন দিলেও তার ঠোঁটের কোণে হাসিটুকু কিছুক্ষণ থেকে গেল।

রিয়ানা হাসলেই তার গালে ছোট্ট একটি টোল পড়ত, যেন সাজেকের পাহাড়ি মেঘ এসে মুহূর্তের জন্য সেখানে থেমে গেছে; আহান প্রথম দিনেই সেই মায়াময় হাসি লক্ষ করেছিল, আর অজান্তেই দৃশ্যটি মনে গেঁথে নিয়েছিল।

আহান মেঘবাড়িতে থাকার দ্বিতীয় দিন থেকেই রিসোর্টের পরিচিত মুখ হয়ে উঠল। সকালে তাকে দেখা যেত পাহাড়ের ঢালে ক্যামেরা হাতে, কখনো মেঘের ছবি তুলতে, কখনো দূরের কোনো গ্রাম থেকে ফিরে আসতে। বিকেলে সে রিসোর্টের বারান্দায় বসে চা খেত। আর প্রায় প্রতিদিনই কোনো না কোনো অজুহাতে রিয়ানার সঙ্গে তার কথা হতো।

আহান খুব বেশি কথা বলত না। কিন্তু যখন বলত, মনে হতো প্রতিটি শব্দ ব্যবহারের আগে সে তাকে মনের ভেতর কয়েকবার ঘুরিয়ে নেয়।

একদিন রিয়ানা জানতে চাইল, “আপনি কি একাই ঘুরে বেড়ান?”

আহান কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, “সবাই সব সময় একা থাকতে চায় না। কখনো কখনো পরিস্থিতি মানুষকে একা করে দেয়।”

“আপনি কি সেই পরিস্থিতি থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন?”

আহান এবার তার দিকে তাকাল। চোখে ক্ষীণ বিস্ময়।

“হয়তো। আমি এমন একটা জায়গা খুঁজছি, যেখানে নিজের কাছেই আর মিথ্যা বলতে হবে না।”

রিয়ানা আর কিছু জিজ্ঞেস করেনি।

আহানের সঙ্গে পরিচয়ের পর রিয়ানাও নিজের অজান্তে বদলাতে শুরু করল। আগে কাজের ফাঁকে সে শুধু ঘড়ি দেখত। এখন কখনো কখনো বারান্দায় দাঁড়িয়ে পাহাড়ের দিকে তাকাত। অতিথিদের গল্প শুনতে শুনতে সে বুঝতে শিখছিল, মানুষের জীবনে সব সম্পর্কের পরিণতি এক রকম হয় না। কেউ ভালোবাসা পেয়েও তাকে ধরে রাখতে পারে না, কেউ অভিমান নিয়ে দূরে সরে যায়, আবার কেউ বহু বছর পরও একই মানুষের পাশে বসে শান্তি খুঁজে পায়।

এক সন্ধ্যায় বৃষ্টি নামল। পাহাড়ের গায়ে মেঘ জমে চারদিক অন্ধকার হয়ে এল। অতিথিরা নিজেদের কটেজে ফিরে গেছেন। রিসোর্টের বারান্দায় শুধু রিয়ানা আর আহান।

দুজনের সামনে ধোঁয়া ওঠা চায়ের কাপ।

আহান বলল, “আপনি সারাদিন সবার খেয়াল রাখেন। নিজের খেয়াল রাখেন?”

রিয়ানা মৃদু হাসল। “নিজের খেয়াল রাখার মতো সময় কোথায়?”

“সময় হয়তো পাওয়া যায় না। তৈরি করে নিতে হয়।”
“সবকিছু কি এত সহজ?”

“না। সহজ হলে মানুষ এত দূরে চলে আসত না।”

বৃষ্টির শব্দের মধ্যে কথাগুলো যেন আরও গভীর হয়ে উঠল।

রিয়ানা কিছুক্ষণ পর বলল, “আপনার জীবনে কি এমন কেউ ছিল, যার কাছে ফিরে যেতে চেয়েও পারেননি?”

আহান চায়ের কাপের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর ধীরে বলল, “ছিল। নীনা। আমরা অনেক স্বপ্ন দেখেছিলাম, কিন্তু একদিন সে চলে গেল। একটা চিঠিতে লিখেছিল, ভালোবাসলেও সবাই সেই ভালোবাসার ভবিষ্যৎ বহন করার সাহস পায় না।”

আহান থামল। “অনেক দিন উত্তর খুঁজেছি। পরে বুঝেছি, কিছু প্রশ্নের উত্তর না পেয়েই বাঁচতে হয়।”

রিয়ানা তার দিকে তাকিয়ে বলল, “একটা মানুষ চলে গেলেই তো জীবনের সব দরজা বন্ধ হয়ে যায় না।”

আহান মৃদু হাসল। “সেটা বুঝতে আমার অনেক সময় লেগেছে। এখন বুঝতে শিখছি।”

বৃষ্টির পানি তখনও টিনের ছাউনিতে শব্দ তুলছিল। রিয়ানা অনুভব করল, তাদের মাঝখানে এমন এক নীরবতা তৈরি হয়েছে, যেখানে সব কথা না বলেও কিছু অনুভূতি পৌঁছে যায়।

এরপরের দিনগুলোতে আহান আর রিয়ানার সম্পর্কের ভেতর ধীরে ধীরে এক ধরনের নির্ভরতা জন্ম নিল। আহান কখনো রিয়ানার জন্য বুনোফুল নিয়ে আসত, কখনো পাহাড়ের এমন কোনো জায়গার কথা বলত, যেখানে সূর্যাস্তের আলো অন্য রকম। রিয়ানা কাজের ফাঁকে তার কথা শুনত, আর

নিজের অজান্তে অপেক্ষা করত দিনের সেই ছোট্ট মুহূর্তটির জন্য, যখন আহান এসে বলবে, "আজ পাহাড়ে একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখলাম।"

তবু তাদের সম্পর্কের নাম কেউ দেয়নি।

রিয়ানা জানত, আহানের ভেতরে এখনো অতীতের কিছু দরজা বন্ধ হয়নি। আর আহান বুঝতে পারত, রিয়ানার হাসির আড়ালেও জমে আছে কিছু না-বলা অভিমান।

এক রাতে রিয়ানা মায়ের ফোন পেল। বহুদিন ধরে বাবা-মায়ের সঙ্গে তার সম্পর্কের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হয়েছিল। কাজের ব্যস্ততা, নিজের সিদ্ধান্ত নিয়ে মতবিরোধ, আর কিছু পুরোনো কষ্ট—সব মিলিয়ে সে ধীরে ধীরে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিল তাদের কাছ থেকে।

ফোনের ওপাশে মায়ের কণ্ঠ শুনে তার বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠল।

"কেমন আছিস, মা?"

রিয়ানা বলল, "ভালো আছি, মা।"

মা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "সময় পেলে একবার বাড়ি আসিস।"

ফোন রেখে রিয়ানা অনেকক্ষণ জানালার পাশে বসে রইল। পরদিন সে বাবাকেও ফোন করল। কথাবার্তা খুব বেশি হয়নি, তবু বহুদিনের জমে থাকা বরফে যেন প্রথম ফাটল ধরল।

সেদিন বিকেলে আহানকে সব কথা বলেছিল রিয়ানা। আহান মন দিয়ে শুনে শুধু বলেছিল, "কিছু সম্পর্ককে নতুন করে শুরু করতে হয় না, রিয়ানা। শুধু ফিরে গিয়ে দরজায় একবার কড়া নাড়তে হয়।"